অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের থেকে মুসলমানরা যে কারণে শ্রেষ্ঠ সেটি নিছক জনশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভাষা, ভূগোল বা অন্য কারণে নয়। সেটি হল আল-কোরআন। একমাত্র তাদের কাছেই রয়েছে বান্দাহর উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহতায়ালার দেওয়া এই শেষ ভাষণটি। কোরআনের ভাষায় এটি হুদাল্লিন্নাস। হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে যখন জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হল তখন তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের বংশধরদের জান্নাতের সুসংবাদও জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল জান্নাতের পথ দেখাতে বহু নবী আসবেন। নবীদের কাছে ওহী নিয়ে ফেরেশতাগণও আসবেন। লক্ষাধিক নবীরাসূল বস্তুতঃ পথ দেখানোর সে কাজটিই করেছেন। মুসলমানেরা এ ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে ভাগ্যবান। পবিত্র কোরআন হলো জান্নাতের পথে চলার সর্বশেষ রোড ম্যাপ, এটিই হলো সেই সিরাতুল মোস্তাকিম। মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো এটি।

সর্বশ্রেষ্ঠ এ নেয়ামত পৌঁছে দিতেই রাহমাতুল্লিল আ'লামিন রূপে এসেছিলেন সর্বশেষ নবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)। বহু বিস্ময়কর আবিস্কারের জনক হলেও এ রোড ম্যাপ আবিস্কারের সামর্থ মানুষের নেই। অথচ মানবিক সভ্যতার নির্মাণে অতি অপরিহার্য হলো এটি। এখান থেকেই মানুষ পায় নীতিবোধ ও মূল্যবোধ। পায় ন্যায়-অন্যায় যাচাইয়ের বিচারবোধ। বাঘের ধারালো নখর যেমন জন্তুটির মাঝে হিংস্রতা বাড়ায়, তেমনি বিজ্ঞানের অগ্রগতি পশুর চেয়েও হিংস্রতর করে মানুষকে। বিগত শতাব্দীতে দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৬ কোটি মানুষের মৃত্যু, বহু কোটি মানুষের পঙ্গুত্ব, হাজার হাজার নগর-বন্দরের বিনাশ ইত্যাদি বর্বরতা কি প্রস্তর যুগের অসভ্য জাতি দ্বারা সাধিত হয়েছিল? হালাকু-চেঙ্গিজের অপরাধ ছিল এ তুলনায় নস্যিতুল্য। অথচ সর্বকালের এ জঘন্য অপরাধটি তো সংঘটিত হয়েছিল তাদের দ্বারা যাদের রয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞান, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে প্রচন্ড অহংকার। আজও যে বর্বরতা নিয়ে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া ও কাশ্মিরের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, ধর্ষিত হচ্ছে নারী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত করা হচ্ছে অসংখ্য ঘরবাড়ী, সে বর্বরতা কি হাজারো বছরের সমুদয় পশুকুল দ্বারা সাধিত হয়েছে? অথচ সেটি হচ্ছে বিশ্বের অত্যাধুনিক রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা। আণবিক বোমা আবিস্কার করলেও উন্নত নীতিবোধ ও মূল্যবোধ তারা গড়তে পারেনি। যান্ত্রিক অগ্রগতি বিস্ময়কর হলেও তাদের দ্বারা মানবিক সভ্যতা নির্মিত হয়নি। পিরামিডের নির্মাণে অতীতে পাথর চাপা পড়ে যেমন বহু সহস্র মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং অত্যাচারিত হয়েছে মিসরের সাধারণ প্রজা, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার নিষ্ঠুর ঘানি টানতে প্রাণ হারাচ্ছে দরিদ্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। পিরামিড যেমন নির্যাতনের প্রতীক, তেমনি আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীক হলো দুর্বল জাতিসমূহের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, শাসন ও বর্বরতা।

অথচ আজ থেকে ১৪শত বছর আগে মানবতা তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। আইনের শাসন,
বর্ণবাদ-রাজতন্ত্র-সামন্তবাদের বিলোপ, সার্বজনীন জ্ঞানচর্চা, ধনিদরিদ্রের সম-অধিকার, নারীর স্বাধীনতা ও সম্পদে তাদের অংশীদারিত্ব, খলিফা হয়ে আটার বস্তা পিঠে টানা বা চাকরকে উটে চড়িয়ে নিজে রশি টানার মত বিস্ময়কর ঘটনাও সেদিন সম্ভব হয়েছিল। মানুষের মহাশূণ্যে ভ্রমনের চেয়েও মুসলমানদের সে অর্জনটি ছিল বেশী বিস্ময়কর। দরিদ্র আরবেরা সেদিন জন্ম দিয়েছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মানবিক সভ্যতাটির। এবং সেটি সম্ভব হয়েছিল আল্লাহর প্রদর্শিত রোড ম্যাপের পূর্ণ অনুসরণের কারণে। সঠিক পথের অনুসরণে মানুষ যে কত দ্রুত কাঙ্খিত লক্ষে

পৌঁছতে পারে এটি ছিলো তারই প্রমাণ। আল্লাহপাক তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের মহফিলে যে গর্ব প্রকাশ করেছিলেন বস্তুতঃ সেটিই সেদিন সার্থকতা পেয়েছিল। বান্দাহ সেদিন আল্লাহর লক্ষ্য পূরণে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। বান্দাহর সে আচরণে মহান আল্লাহ এতই খুশী হয়েছিলেন যে সে সন্তুষ্টির কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ ‘রাদীআল্লাহু আনহু ওয়া রাদূ আনহু।” অর্থঃ আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর উপর।”

প্রশ্ন হলো, আজকের মুসলমানেরা কেন এত অধঃপতিত? কোরআন তো আজও অবিকৃত। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে ব্যাধি ১৪ শত বছর পূর্বে আরোগ্য পেল সেটি কেন আজ মুসলিম বিশ্বে জেঁকে বসে আছে? পথ সঠিক হলে গাধার পিঠে বা পায়ে হেঁটেও গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যায়। কিন্তু ভ্রান্ত পথে উন্নত যানেও সেটি অসম্ভব। আল্লাহর প্রদর্শিত পথের গুরুত্ব এখানেই। মুসলমানদের বর্তমান ব্যর্থতাই বলে দেয় সঠিক পথে তারা চলছে না। সন্ত্রাস, দূর্নীতি, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের যে স্থানে তারা পৌছেছে ইসলামের পথে চলে সেখানে কেউ পৌছায় না। ইসলাম যে সর্বক্ষেত্রে সফলতার পথ সেটি ১৪ বছর পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। এ পথের গুণেই মুসলমানগণ ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সফলতার উচ্চমার্গে পৌঁছেছিলো। বিশ্বের অন্য জাতিরা তখন অশিক্ষা-অজ্ঞতা-অপসংস্কৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বিশ্বজুড়ে ছিল বর্বরতম স্বৈরাচার। ছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহ। ধর্মের নামে মানুষ তখনও মূর্তি, অগ্নি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এমনকি সাপ-শকুনকেও দেবতা বলে পূজা করতো। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছিল উলঙ্গতা। নারী ছিল অধিকার বঞ্চিত ভোগ্যসামগ্রী। বিশ্বজুড়ে ছিল বর্ণবাদ, ছিল দাসপ্রথা। কিন্তু সে অন্ধকারের যুগে দ্রুত উন্নতির রেকর্ড গড়েছিল মুসলমানেরা।

কিন্তু আজ কেন এ দূর্গতি? রোডম্যাপ কাউকে গন্তব্যস্থলে টানে না। এটি পথ দেখায় মাত্র। পথটি জেনে নিতে হয় এবং সেটির অনুসরণ করতে হয় ব্যক্তিকেই। এজন্য যেটি অপরিহার্য সেটি হলো রোডম্যাপ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ। ইসলামে জ্ঞানার্জন এজন্যই ফরয। কারণ, জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর দেওয়া রোডম্যাপ থেকে পাঠোদ্ধার কি সম্ভব? সম্ভব কি নির্দেশনা লাভ? এটির অভাবে হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায় জানা হয় না। ইসলামে জ্ঞানার্জন তাই নিছক সামাজিক, অর্থনৈতিক বা কারিগরি বিষয় নয়, এটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। তাই না বুঝে কোরআন তেলাওয়াতে বা সেটি জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়াতে জ্ঞানার্জনের ফরয আদায় হয় না। আদায় হয় না বলেই তেলাওয়াত ফরয করা হয়নি, ফরয করা হয়েছে কোরআনের শিক্ষালাভকে। তথা জ্ঞান-লাভকে। কিন্তু নিছক তেলাওয়াতে হেদায়ত মেলে কি? অথচ হেদায়াত না পেলে মুসলমান থাকাই তো অসম্ভব। আর হেদায়াত যে মেলেনি সে প্রমাণ কি কম? হেদায়েত না পাওয়ার কারণেই কোরআন তেলাওয়াতকারি সুদ খায়, ঘুষ খায় এবং নানাক্ষধি দূর্নীতিতে লিপ্ত হয়। কোরআন তেলওয়াত হচ্ছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। রমযানে কোরআন খতম হয় মসজিদে মসজিদে। যে অফিসে ঘুষ ও দূর্নীতির সয়লাব সেখানেও প্রচুর নামাযী। তেলওয়াতকারীর সংখ্যাও অনেক। অথচ দেশ দূর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম। সয়লাব চলছে বেপর্দা, নগ্নতা ও ব্যভিচারের। নগর-বন্দরে বাজার বসেছে পতিতাবৃত্তির।

কোরআন থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও সেগুলির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে করুণাময় মহান আল্লাহ বলেছেন, “কিতাবুন আনযালনাহু ইলাইকা মুবারাকুল লিইয়াদ্দাবারু আয়াতিহি ওয়া লিইয়াতাযাক্কারু উলুল আলবাব।” (সুরা সোয়াদ আয়াত ২৯) অর্থঃ 'রহমতপূর্ণ এ কিতাব আপনার উপর এজন্য নাযিল করেছি যে যেন এর আয়াতগুলো নিয়ে তারা (ঈমানদারেরা) ভাবতে পারে এবং যারা সমঝদার ব্যক্তি তারা যেন হুশিয়ার হয়ে যায়।'এ আয়াতে কোরআন নাযিলের মুখ্য

Written by ফরিদ আহমেদ রেজা কামাল
Saturday, 01 January 2011 19:04 -

উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। কোরআন এ জন্য নাযিল হয়নি যে ঈমানদারেরা শুধু তেলাওয়াত করবে। বরং আয়াতগুলো নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করবে। এ কিতাবে যে নির্দেশাবলী এসেছে তা থেকে তারা শিক্ষা নিবে। এভাবে নিজেদের ইহকাল ও আখেরাত বাঁচাতে তারা হুশিয়ার হবে। আল্লাহর এ হুশিয়ারির পর কোন মুসলমান কি নিছক কোরআনের তেলাওয়াত নিয়ে খুশি থাকতে পারে? তাছাড়া প্রশ্ন হলো, কোন কিছু না বুঝে তা নিয়ে কি ভাবা যায়? সম্ভব কি তা থেকে কোন শিক্ষা লাভ? কোন বিষয়ে ভাবতে হলে সেটি প্রথমে জানতে ও বুঝতে হয়। ভাবনা শূণ্যে হয় না। ভূতের গল্প শুনে শিশুও জানতে চায় ভূতের হাত-পা-মাথা কেমন, দেখতে কেমন ইত্যাদি। কারণ ভূতকে নিয়ে শিশুও ভাবতে চায়। কিছু বুঝতেও চায়। এটিই স্বাভাবিক। এটিই মানুষের ফিতরাত। কিন্তু মুসলমান সে ফিতরাত-সুলভ স্বাভাবিক আচরণ করেনি কোরআনের সাথে।

বাংলাদেশের মানুষ দূর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম হয়েই বিশ্বকে অবাক করেনি বরং তার চেয়ে অবাক করেছে কোরআন শিক্ষার নামে সারা দেশে কোরআনের অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত শিখিয়ে। বাংলাদেশের আলেমদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো এটি। তারা জ্ঞানার্জনের ফরয কাজটির গুরুত্ব সরেছে তেলাওয়াত শিখিয়ে। তেলাওয়াতে যে জ্ঞানার্জনের ফরয আদায় হয় না সে সত্যটি তারা নিজে যেমন বুঝেনি তেমনি ছাত্রদেরও বুঝতে দেয়নি। কোন রাজা কি এটুকুতে খুশি থাকে যে প্রজারা তার হুকুম শুধু পড়বে অথচ বুঝবে না এবং পালনও করবে না? প্রজাদের এমন আচরণে কি রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বাড়ে? মুসলমান মাত্রই তো আল্লাহর সৈনিক। কিন্ত তাঁর সৈনিকেরা যদি আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের হুকুম বুঝা ও মান্য করার বদলে তেলাওয়াত নিয়ে ব্যস্ত থাকে তবে কি আল্লাহর দ্বীন কোথাও বিজয়ী হবে? বান্দাহর এমন আচরনে আল্লাহপাক কি খুশী হবেন? এ অপরাধে আযাব এসেছিল বনী ইসরাইলের উপর। তাদের প্রতি মহান আল্লাহার হুশিয়ারি এসেছে এভাবেঃ "ওয়া আনতুম তাতলুউনা কিতাবা আফালা তা'কিলুন" (সুরা বাকারা আয়াত ৪৪) অর্থঃ 'এবং তোমরা এ কিতাবকে তেলাওয়াত করো অথচ সেগুলো নিয়ে কি চিন্তাভাবনা করনা।' আল্লাহপাক তাঁর কিতাবের সাথে বনী ইসরাঈলীদের আচরণে কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এটি হলো তারই প্রমাণ। কথা হলো, কোরআনের সাথে বাংলাদেশী মুসলমানদের আচরণ কি ভিন্নতর? না বুঝে তেলাওয়াতে কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয় না বরং এতে অবমাননা হয় সে বোধও কি লোপ পেয়েছে?
অথচ বাংলাদেশে যত দ্বীনি মাদ্রাসা আছে দুনিয়ার আর কোন দেশে তা নেই। একটি জিলাতে যত মাদ্রাসা তা খোলাফায়ে রাশেদার সময় সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ছিল না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এসব মাদ্রাসা থেকে তৈরী হয়েছিল হাজারে হাজারে মোজাহিদ, শহীদ ও ধর্ম-প্রচারক। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তাঁরা পাহাড় পর্বত অতিক্রম করেছেন।

অথচ বাংলাদেশের মাদ্রাসা থেকে যারা তৈরী হচ্ছেন তাদের সামর্থ মিলাদ, মুর্দাদাফন, বিবাহ পড়ানো ও ইমামতির বাইরে সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন, দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে নজরে পড়ার মত নয়। বাংলাদেশে প্রকাশিত বইয়ের শতকরা ৫ ভাগের লেখকও তাঁরা নন। অথচ সমাজে তারাই আলেম বা জ্ঞানীর টাইটেল ধারি। আরো বিস্ময়ের বিষয়, বহু আলেম এবং মসজিদের বহু ইমাম শরিয়ত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দুনিয়াদারি রাজনীতি বলে মসজিদের জায়নামাজে নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ ইসলামে রাজনীতি অতি উচ্চতর ইবাদত। এ ইবাদতে বিনিয়োগ হয় ঈমানদারের অর্থ, সময়, শ্রম ও রক্ত। এবং একমাত্র এ ইবাদতের মাধ্যমেই অর্জিত হয় আল্লাহর দ্বীনের বিজয়। এটি জিহাদ। যারা এ জিহাদে ইবাদতে প্রাণ দেয় তাদেরকে শহিদ বলা হয়। মৃত্যুর পরও মহান আল্লাহ এমন শহিদদেরকে রেজেক দিয়ে থাকেন। জীবনের প্রতিটি রাতের সবটুকু সময় নামাযে কাটালেও এ সম্মান জুটবে সে ওয়াদা মহান আল্লাহপাক ঘোষণা পবিত্র কোরআনের কোথাও দেননি। অথচ যারা রাষ্ট্রে দ্বীনের বিজয়ে শহিদ হবে তাদেরকে সে প্রতিশ্র"তি বারবার শোনানো হয়েছে। মহান রাসূলে পাক (সাঃ) শরিয়ত প্রতিষ্ঠার এ রাজনীতিকে মসজিদের জায়নামায থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে নিয়ে গেছেন।

অসুস্থ ব্যক্তিকে বাঁচানো বা অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানদান ইসলামে অতি উত্তম ইবাদত। কারণ এর একটি মানুষের দেহ এবং অপরটি বিবেক বাঁচানোর কাজ। তাই অতীতে ঈমানদারগণ চিকিৎসক, শিক্ষক বা মসজিদের খতিব হওয়াকে অতি পছন্দ করতেন।

কিন্তু রাজনীতি শুধু ব্যক্তিকে বাঁচানোর কাজ নয়। এখানে যে চেতনাটি কাজ করে সেটি জাতি বা উম্মাহকে বাঁচানোর। ফলে রাজনীতির চেয়ে আর কোন কাজ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? এটি তো জিহাদ। তাই রাজনীতির সমকক্ষ একমাত্র রাজনীতিই। রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বয়ং নবীজী (সাঃ)। রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে বসেছেন তিনি নিজে। এবং পরাজিত করেছেন আবু জেহেল ও আবু লাহাবদের। বসেছেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর মত মহান সাহাবী। তাই এ আসনে কি ইসলামে অঙ্গিকারশূণ্য সেক্যুলারদের বসানো যায়? অথচ অধিকাংশ মুসলিম দেশের মুসলমানগণ নিজের ভোট দিয়ে এবং নিজ অর্থ, শ্রম ও রক্তের খরচে তাদেরকেই বসিয়েছে। এতে কি মুসলমানদের স্বার্থ ও সুরক্ষা হয়? আসে কি বিজয়? দেশে দেশে মুসলমানদের আজ যে বিপন্নদশা তার মূল কারণ, রাজনীতি দখলে নেওয়ার এ মহান ইবাদত গুরুত্ব পায়নি। বরং দ্বীনদারি রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে রাজনীতি থেকে দূরে থাকাটি। ফলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দখল নিয়েছে ইসলামে অঙ্গিকারহীন সেক্যুলারগণ। কথা হল, ইসলামে অঙ্গিকারহীন হলে কি কেউ মুসলমান থাকে?

মুসলমান হওয়ার অর্থই হল ইসলামে অঙ্গিকারবদ্ধতা। সেটি যেমন ব্যক্তিজীবনে তেমনি রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে। ইসলামে ঈমান আনার সাথে সাথে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ তাই ইসলামের বিজয়ে প্রাণও দিয়েছে। প্রতিটি মুসলিম দেশে যাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল সেটি হল সেক্যুলার রাজনীতি। কিছু লোকের মদ্যপাণ, পতিতাবৃত্তি বা চুরি-ডাকাতিতে সমগ্র জাতি পরাজিত হয় না। ধ্বংসও হয় না। এমন পাপী নবীজীর (সাঃ) আমলেও ছিল। কিন্তু সেক্যুলার রাজনীতি কোন মুসলিম দেশে বিজয়ী হলে তাতে বিপন্ন হয় ইসলাম, ইসলামের বিজয় বা শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। তখন ইসলামে অঙ্গিকারবদ্ধতা ফৌজদারি অপরাধে পরিণত হয়। বহু মুসলিম দেশে মুসলিম নির্যাতন তাই রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়ীক রাজনীতি রূপে চিহ্নিত হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের ন্যায় মুসলিম দেশগুলোতে মূলত তাই হয়েছে। এর মূল কারণ, দেশের রাজনীতিতে প্রবল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ইসলামে অঙ্গিকারহীন দুর্বৃত্তরা। অথচ তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলেন! অনেকে নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাতও করেন! প্রশ্ন হল, ইসলামের প্রতিষ্ঠার যারা বিরোধীতা বা সেটি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখেন তারা কি ঈমানদার হওয়ার দায়বদ্ধতা বুঝেন? এমন আচরণ যে দুনিয়ায় ও আখেরাতে কত ভয়াক্ষহ আযাব ডেকে আনে সে হুশ কি তাদের আছে? এটি তো আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আল্লাহতো চান ইসলামের বিজয় (লিইয়ুযহিরাহু আলা দ্বীনি কুল্লিহি)। তাই বাংলাদেশের ন্যায় মুসলিম দেশে সেক্যুলারগণ আজ যা বলছে নবীজীর যুগে তা মুনাফিকরাও প্রকাশ্যে বলতে ভয় পেত।

মুসলিম সমাজে আজ যেটি ঘটছে তার মূল কারণ অজ্ঞতা বা জাহেলিয়াত। জাহেলিয়াতের এ রোগ সারাতে হলে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল, কোরআন চর্চা। নিছক তেলাওয়াত নয়। নবী করীমের (সাঃ) সময় কোরআন বুঝাটি এতই গুরুত্ব পেয়েছিল যে দূর-দূরান্ত থেকে সাহাবাগণ নবীজীর (সাঃ) কাছে ছুটে আসতেন এটুকু জানতে যে, আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে

কোন নতুন ওহী এসেছে কিনা। ওহী নাযিল হল অথচ সেটি জানা হল না এবং মান্য করা হল না, এ অপরাধে জাহান্নাম যেতে হবে এ ভয়ে প্রতিটি সাহাবী ছিলেন সজাগ। আল্লাহর নাযীলকৃত আয়াতগুলো শুধু মুখস্থই করতেন না বরং তা নিয়ে চিন্তা ভাবনাও করতেন। কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় না গিয়েও চিন্তা ভাবনার বলে প্রতিটি সাহাবী পরিণত হয়েছিলেন বিখ্যাত আলেমে ও দার্শনিকে। মুসলিম বিশ্বের নানা জনপদে তারাই সেনাপতি, প্রশাসক, বিচারক, মুফতি, মুফাস্সির, মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালন করেছেন। অথচ তারা ছিলেন কৃষক, শ্রমিক বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। জ্ঞানার্জন নিছক মাদ্রাসার শিক্ষক বা মসজিদের ইমামদের দায়িত্ব নয়, সে দায়িত্ব যে প্রতিটি মুসলমানের। সাহাবায়ে কেরাম তারই দৃষ্টান্ত। তাই রাসূলে পাকের সাহাবা ছিলেন অথচ আলেম ছিলেন না সে নজির নেই। জ্ঞানার্জনে তৎপর ছিলেন পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও। বস্তুতঃ মুত্তাকী হওয়ার জন্য এ ছাড়া ভিন্ন পথ নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক সে ঘোষণাটি দিয়েছেন এভাবেঃ “ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা (সূরা ফাতির আয়াত ২৮)” অর্থঃ “বান্দাহদের মাঝে একমাত্র আলেমেরাই আমাকে ভয় করে।” অর্থাৎ যার মধ্যে জ্ঞান বা ইলম নেই তার মধ্যে আল্লাহর ভয়ও নেই। তাকওয়া সৃষ্টির জন্য তাই অপরিহার্য হলো ইলম চর্চা। ইলম অর্জন এজন্যই ফরয।

নিজের নামায-রোযা যেমন নিজে করতে হয়, তেমনি জ্ঞানার্জনের ফরযটিও নিজে আদায় করতে হয়। কোন শিক্ষক বা হুজুরের মুখে দিকে তাকিয়ে সে ফরয আদায় হবে না। ফলে ইসলামের গৌরব যুগে ইসলাম কবুলের সাথে কোরআন বুঝাটিও প্রতিটি নও মুসলমানের কাছে গুরুত্ব পেত। এটিকে তাঁরা অপরিহার্য ভাবতেন। সেদিন কোরআনের এ ভাষা নবদীক্ষিত মুসলমানদের আত্মায় পুষ্টি জোগাতে পাইপ লাইনের কাজ করেছিল। এ ভাষাটির মাধ্যমে ব্যক্তি সংযোগ পেয়েছিল আল্লাহর নাযিলকৃত জ্ঞানের বিশাল মহাসমুদ্রের সাথে। ফলে সেদিন পুষ্টি পেয়েছিল তাদের আত্মা ও বিবেক। ফলে গড়ে উঠেছিল কোরআনী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি। নির্মিত হয়েছিল অতি-মানবিক ইসলামি সভ্যতা। অথচ আজকের মুসলমানদের ব্যর্থতা এক্ষেত্রে প্রকট। কারণ, কোরআনের সাথে সম্পর্কহীনতার কারণে তাদের আত্মা বা রূহ সে কাঙ্খিত পুষ্টিই পায়নি। এমন সংযোগ-হীনতায় মানুষ শুধু পশু নয় বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। তখন জন্ম সূত্রে মুসলমান হলেও মৃত্যু ঘটে ইসলামী চেতনার। বিলুপ্ত হয় ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। বাংলাদেশে দূর্নীতি, সন্ত্রাস, ব্যাভিচার ও নগ্নতার প্রসার বেড়েছে একারণেই। মানুষ চালিত হচ্ছে নিছক বেঁচে থাকার জৈবিক স্বার্থে। বিদ্যাশিক্ষায় অর্থব্যয় পরিণত হয়েছে ব্যবসায়ীক বিণিয়োগের খাতে। এ চেতনায় মানুষ মনযোগী হয় বিদেশী ভাষা শিক্ষায়। কারণ এতে রয়েছে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। অর্থপ্রাপ্তির লোভেই বিপুল অর্থব্যয়ে সন্তানদের বিদেশে পাঠাচ্ছে। ফলে ইংরেজী, ফরাশী, জাপানীসহ বহু বিদেশী ভাষাও শিখছে। কিন্তু যে ভাষাটি না জানা হলে জীবনের মুল প্রশ্নপত্রটি অজানা থেকে যায় এবং অসম্ভব হয় মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকাটিও তা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই। ফলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মূল ফরযটিই আদায় হচ্ছে না। ফলে সম্ভব হচ্ছে না আল্লাহভীরু মোত্তাকী রূপে মুসলমানের বেড়ে উঠাটিও। আজকের মুসলমানদের এটিই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। লন্ডন, ২০/১০/২০০৬